সূচিপত্র

বিদায়	১৩
আদিল	২০
উপহার	২৮
মরীচিকা	৩৩
সংকেত	৪০
প্রত্যাবর্তন	৪৬
ভাবান্তর	৫৪
খোলা দরজা	৫৭
অসততা	৬৬
শুধু শুরু করো	৭৩
প্রবাসের প্রহেলিকা	৮০
আমানত	৮৬
প্রেরণার উৎস	৯২
সংশয়	৯৬
তুমি ও তোমার মেষ	১০১
সাদাকার হিসেব	১০৬

কিয়ামতের বিভীষিকা ১১১
আল্লাহ তোমাকে দয়া করুন ১১৫
সন্তানের মা ১১৭
অনন্ত যাত্রা ১২৩
ঈদ ১৩১
বিরহের অশ্রু ১৩৭
কুরআনের শক্তি ১৪০
দুআ ১৫০
হৃদয়ের জাগরণ ১৫৪
ঝড় ১৫৮
দ্বিতীয় বাড়ি ১৬৪
জাদুকর ১৬৯
শংকা ১৮১
গাফলতি ১৮৬

প্রত্যাবর্তন

[এক]

দুই বছর হলো আমার বিয়ে হয়েছে। এই দুই বছরে একটি বারের জন্যও আমি থিতু হয়ে বসতে পারিনি। মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি খুঁজে পাইনি; বরং প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে দিন বদলের আন্দোলনে। স্বামীর মন ও প্রকৃতি পরিবর্তনের নিরন্তর যুদ্ধে—ভয়ানক উৎকণ্ঠা ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে।

আমার পরিবারের লোকেরা ধারণা করত—'বিয়ের মধ্যে বিশেষ একটি জাদু-শক্তি আছে। বিয়ের সংস্পর্শে এলে মানুষ আপনিই বদলে যায়। অন্তত স্বামী বা স্ত্রীর একটুখানি সদিচ্ছা ও সচেতনতা তার সঙ্গীকে বদলে যেতে বাধ্য করে।'

তাই বিয়ের আগে দার্শনিকের সুরে আমাকে জানানো হয়েছিল—'লোকটি অনেক ভালো। সরল প্রকৃতির। ধর্মানুরাগী। অবশ্য ধর্মীয় কিছু বিষয়ে তার একাগ্রতা ও আন্তরিকতার কিছুটা অভাব রয়েছে। তবে আশার কথা এই যে, তুমি তার সরলতাকে কাজে লাগিয়ে খুব সহজেই তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। তাকে দ্বীন পালনে সাহায্য ও উৎসাহ যোগাতে পারবে। এতে তুমি দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হবে।'

তারা আরও মনে করত—'বড় ভাইয়ের আগে ছোট ভাইয়ের বিয়ে করা অসামাজিক ও অনভিপ্রেত। আর বড় বোনের আগে ছোট বোনের বিয়ে হওয়া সাক্ষাৎ অভিশাপ।

কোথাও এমন হয়ে থাকলে বড় বোনের বিয়ে অসম্ভব ও সুদূর পরাহত।'

আর আমার আগেই যেহেতু আমার ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তাই সমাজবিজ্ঞানীদের মতো করে আমাকে বলা হতো—'তোমার আগে তোমার ছোটবোনের বিয়ে হয়ে গেছে। তাছাড়া বয়সও তো কম হয়নি। এমতাবস্থায় এর চেয়ে ভালো পাত্র পাওয়া অসম্ভব। সুতরাং, আমাদের দৃষ্টিতে সার্বিক বিচারে এই ছেলেটিই তোমার জন্য যথোপযুক্ত।'

এছাড়াও স্বামীর ভালোমন্দ নিরূপণের জন্য তাদের কাছে বিশেষ একটি মানদণ্ড ছিল। সেটি হলো ভালো চাকুরি, ভালো পদ, ভালো পরিবার এবং বংশকৌলিন্য। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমার বর এই মানদণ্ডে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ ছিল। একারণে এই লোককে বিয়ে করার জন্য আমার আম্মু ভীষণ পীড়াপীড়ি শুরু করেছিলেন।

কিন্তু আমার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। আমি কারও বাহ্যিকতায় বিশ্বাস করতাম না। লৌকিকতাকে গুরুত্ব দিতাম না। এ কারণে বিয়ের পূর্বে আমি শুধু দ্বীন ও ধার্মিকতা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। কেননা, এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু পরিবারের অতি উচ্ছ্বাসের তোড়ে আমার সেই চাওয়া-পাওয়া ভেসে গেছে। আমার ইচ্ছে ও আর্তনাদ তাদের কানেই পৌঁছেনি।

আমি চেষ্টা করেছিলাম এমন একজন ধার্মিক স্বামী খুঁজে বের করতে—'ধর্ম-পালনের ক্ষেত্রে যার সঙ্গে আমার বিশেষ ব্যবধান থাকবে না। বিয়ের পরে দিন বদলের আন্দোলনে ক্লান্ত হয়ে পড়ব না; বরং শান্তির ভেলায় চড়ে আনন্দ-বিহার করব। একজন আরেকজনের কাছে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি খুঁজে পাব। পারিবারিক স্বাধীনতা ও ধর্মীয় নিরাপত্তা লাভ করব। পরস্পরকে সৎকাজে সহায়তা করব। সম্মান করব। মূল্যায়ন করব এবং সম্মান ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে ভালোবাসার অটুট বন্ধন তৈরি করব। আর এটা করতে না পারলে, পরস্পরকে সসম্মানে বিদায় জানাব এবং কৃতজ্ঞ থাকব।'

তাছাড়া বিবাহিতদের জীবনের অনেক সমস্যা সম্পর্কেই আমি অবহিত ছিলাম। এসবের পেছনে মূল কারণ হলো, দ্বীনদারীর অভাব ও চারিত্রিক দুর্বলতা। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে এই দুটি দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতাম। পাশাপাশি এ দুটি ক্ষেত্রে দৃঢ়তা ও অবিচলতার জন্য এমন একজন ধার্মিক সুপুরুষের স্বপ্ন দেখতাম—'যে আমাকে মধ্যরাতে সালাতের জন্য জাগিয়ে দেবে। তাহাজ্জুদে

উৎসাহিত করবে। আমরা একসাথে এক জায়নামাযে বসে অশ্রু ঝরাব। কৃতজ্ঞতা ও অনুশোচনার অশ্রুতে পাপরাশি মুছে ফেলব। আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অবলম্বন করে ঘর-সংসার করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে একসাথে আল্লাহর দিকে ছুটে চলব। অন্যথায় সানন্দে বিচ্ছেদ বরণ করব।'

আমি এমন একজন জীবনসঙ্গীর স্বপ্ন বুকে লালন করতাম—'যার সহযোগিতায় আমি সন্তানদের ইসলামী অনুশাসনে গড়ে তুলতে পারব। স্বামী-সন্তান নিয়ে কাবার সামনে দাঁড়িয়ে পরস্পরের জন্য দুআ করব। তাহাজ্জুদের সালাতে আমরা সবাই পাশাপাশি দাঁড়াব। ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে হাতেহাত ধরে স্বামী-সন্তানের মসজিদে গমনের নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকন করব। স্বামী মসজিদ থেকে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করবে—'আজ কুরআন কতটুকু মুখস্থ করেছে? আজ কয়-পারা কুরআন তিলাওয়াত করেছ?

সন্তান বলবে—'আম্মু আমি আজ মসজিদে প্রবেশের দুআ শিখেছি। তুমি শিখবে?...'

এই স্বপ্ন পূরণের জন্য আমি গভীর রাতে তাহাজ্জুদ পড়তাম। অঝোরে অশ্রু ঝরাতাম।

এই সব স্বপ্নের কারণেই হয়তো আমি বেশি সন্তান নেওয়ার চিন্তা করতাম। এমন একটি স্বপ্নময় পরিবার ও শান্তিময় পরিবেশ কে না চাইবে? তাই আমি আমার পরিবারকে অনেক সম্প্রসারিত করার স্বপ্ন দেখতাম। ছেলে-সন্তানের কলকাকলিতে ঘরদোর মুখরিত রাখতে চাইতাম। তাছাড়া আমি কামনা করতাম—আমার মাধ্যমে অনেক সন্তান জন্মলাভ করুক এবং সকলেই এক আল্লাহর ইবাদাতে নিজেদের নিরত রাখুক। কেননা, এটি নারীর সর্বোচ্চ সম্মাননা। এতে নারীর সাওয়াব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।'

বিয়ের আগে এ ধরনের স্বপ্ন দেখে আনন্দ পেতাম। বেঁচে থাকার প্রেরণা পেতাম। আর বিয়ের পরে ফেলা আসা সেই স্বপ্নের কথা ভেবে অশ্রু ঝরাই। যখন একেবারে হতাশ হয়ে পড়ি, তখন এই বলে নিজেকে প্রবোধ দিই—'আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল'—সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর।

আমি সওয়াবের আশা করেই পরিবারের পছন্দের পাত্রকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। তার ওপর ভরসা করেছিলাম। প্রথম দিকে সে সালাত আদায় করত;

কিন্তু দিন দিন কেন যেন সে দ্বীন পালনে উদাসীন হয়ে পড়ে।

‘কী দরকার? আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়ব।’

‘এখনো অনেক সময় আছে। এত তাড়াহুড়ার কী আছে?’

তাকে জামাআতে সালাত আদায়ের কথা বললে আমাকে প্রায়ই এ কথাগুলো শুনতে হতো। তবে আমার কথায় হয়তো তার মাঝে একটু হলেও প্রভাব পড়ত। আর এটিই আমার মনে আশার সঞ্চার করত।

আমি তার খারাপ সঙ্গীদের ব্যাপারে খুব বেশি ভয় করতাম। কারণ, সে মাঝেমধ্যেই তার বন্ধুদের কথা বলত। একবার ভাবলাম, তাকে পরামর্শ না দিয়ে অথবা পরামর্শের চেয়েও ভালো কোনোকিছু দিয়ে বোঝানো যায় কি না? তাকে যদি কোনো ভালো ও সৎকর্মশীল ব্যক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে হয়তো ওই ব্যক্তির সংস্পর্শে তার মধ্যে কিছুটা হলেও বোধোদয় ঘটবে!

[দুই]

তাকে দ্বীনের পথে ফেরাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে লাগলাম। আমার এক বান্ধবীর স্বামী অত্যন্ত দ্বীনদার ও সৎকর্মপরায়ণ। আমি তাকে ফোন করে তার স্বামীসহ আমাদের বাসায় দাওয়াত দিলাম। বান্ধবী সানন্দে দাওয়াত কবুল করল। এক সপ্তাহ পরে বান্ধবী তার স্বামীকে নিয়ে আমাদের বাসায় এলো। তাদের দেখে খুশিতে আমার হৃদয় নেচে উঠল। আমি প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে এবং হৃদয়ের স্পন্দনে প্রার্থনা করতে লাগলাম—‘হে আল্লাহ, আমার স্বামীর হৃদয়ে এই ভদ্রলোকের প্রতি ভালোবাসা উদ্রেক করো!’

আমার স্বামীর সাথে তার অনেকক্ষণ কথাবার্তা হলো। যতক্ষণ তারা পরস্পর কথা বলছিল, ততক্ষণ আমার বুক ধুকপুক করছিল। আলাপচারিতা শেষে খাওয়া-দাওয়ার পর্ব ছিল। খাওয়া-দাওয়া শেষে আমারা তাদের বিদায় জানালাম।

এরপর তার কাছে এসে বসলাম। তার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘বলো তো, ভদ্রলোককে তোমার কাছে কেমন মনে হয়েছে?’ সে বলল, ‘লোকটি

তো ভালোই। আচার-ব্যবহারও যথেষ্ট মার্জিত।'

ব্যস, এতটুকু বলেই সে ক্ষান্ত হলো। বাড়তি কোনো আবেগ, উচ্ছ্বাস বা ভালো লাগা তার মধ্যে দেখা গেল না। তাদের বাড়িতে যাওয়া অথবা লোকটিকে আবার আমাদের বাসায় দাওয়াত করার ব্যাপারে কোনো আগ্রহও দেখা গেল না।

তবুও আমি হাল ছাড়লাম না। তাকে জামাআতের সাথে সালাত আদায়ে অভ্যস্ত করার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা করে যেতে লাগলাম।

[তিন]

প্রথম সন্তানের জন্মের পর আমার এই চেষ্টা আরও বেড়ে যায়। আমি তখন একা একাই রাত জাগি। সে তার বন্ধুদের সাথে সারা রাত ফুর্তি করে, আর আমি ছেলে নিয়ে কান্নাকাটি করি। আমি তার হিদায়াতের জন্য ব্যাকুলভাবে দুআ করি। ঠিক করি, এখন থেকে প্রতি রাতে তাহাজ্জুদের সালাত তার পাশেই আদায় করব। এতে যদি আল্লাহ তার মাঝে ভাবান্তর ঘটান!

এই দৃষ্টিকোণ থেকে সালাতগুলো যথাসম্ভব দীর্ঘ করার চেষ্টা করতাম। মাঝে মাঝে সে ঘুম থেকে উঠে দেখত, আমি সালাত আদায় করছি। আমি বুঝতে পারতাম, আমার দীর্ঘ সালাতগুলো তার মধ্যে প্রভাব ফেলছে।

একদিন বিকেলে সে আচমকা সফরে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। আমাকে তার জামা-কাপড় গুছিয়ে দিতে বলে। কোন এক শহরে তার কী যেন একটি কাজ পড়েছে। এক্ষুনি তাকে যেতে হবে। আমি তাকে বিশ্বাস করতাম। তার কথার সত্যতা কখনোই অন্য কারও কাছে যাচাই করতাম না। সে প্রায়ই সফরে যায়; কিন্তু সফরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। খুব বেশি অনুরোধ করলে সর্বোচ্চ হোটেলের রুম ও ফোন নম্বর জানায়। হোটেলে ফোন করলে আমি তার অবস্থান জানতে পারি। অবশ্য কদাচিতই এমন হয়। অধিকাংশ সময়েই আমি তার অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানতে পারি না। তারপরও আমি তাকে বিশ্বাস করি। তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা করি না। এতে কেন জানি, নিজেকেই ছোট মনে হয়।

প্রতিবারের মতো এবারের সফরেও আমি তার জন্য মন ভরে দুআ করলাম। সফরে যাওয়ার পরদিন সে তার নিজের নম্বর থেকে ফোন করল। বুঝলাম, সে দেশেই

আছে। তারপরের তিন দিন কোনো কল এলো না। আমার কলও রিসিভ করল না। চতুর্থ দিন একটি কল এলো। অপর পাশ থেকে তার করুণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। তার কণ্ঠস্বর শুনে আমার বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে?'

সে বলল, 'আমি আজ রাতেই আসব, ইন শা আল্লাহ।'

বুঝতে পারছিলাম—সে কাঁদছে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে তোমার?' আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সে বাচ্চাদের মতো কাঁদতে লাগল। তার কান্নার অবস্থা দেখে আমি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলাম না। কোনোকিছু না বুঝেই আমিও তার সাথে কাঁদতে লাগলাম।

পরদিন সে বাসায় ফিরে এলো। আমাকে দেখেই আগের মতো কান্না শুরু করল। আমিও কাঁদছি তার সাথে। কিছুক্ষণ পর সে কান্না থামিয়ে আমার দিকে তাকাল। তার গাল বেয়ে তখনো টপটপ করে পানি ঝরছে।

অবশেষে চোখ মুছে সে জানাল, 'আমার সহকর্মী আর আমি একসাথে সফরে বেরিয়ে ছিলাম। আমাদের রুম দুটি পাশাপাশিই ছিল। দুজনের মধ্যে কেবল একটি দেয়ালের ব্যবধান ছিল। ওই রাতে আমরা একসাথে ডিনার করি। ডিনারের পরে যথারীতি গল্পগুজব করি। অনেক হাসি-তামাশা করি। রাতের শহর সবসময়ই ভিন্ন একরূপে ধরা দেয়। তাই রাতের শহর দেখতে অথবা শহরের রাস্তাগুলোতে ঘুরে বেড়াতে বেশ ভালো লাগে। আমরা একটানা দুই ঘণ্টার মতো শহরের পথেঘাটে ঘুরে বেড়াই। এই সময়গুলোতে প্রচুর অশালীন গল্প করি এবং অশ্লীল দৃশ্যাবলি দেখি।

ঘোরাঘুরির পর্ব শেষ করে আমরা যে-যার ঘরে ঘুমাতে চলে যাই। গভীর ঘুমে রাতটা যেন নিমিষেই কেটে যায়। সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ঘুম থেকে জাগি। তাড়াহুড়ো করে ফজরের সালাত আদায় করি। সূর্য ওঠার পরে ফজরের সালাত আদায় করা এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সালাত শেষ করে আমার বন্ধুকে ফোন করি। কয়েকবার রিং হবার পরও সে ফোন রিসিভ করে না। আরও কয়েকবার চেষ্টা করেও সাড়া পাই না। ভাবি, হয়তো সে ওয়াশরুমে গেছে। এক গ্লাস দুধ পান করে তাকে আবার ফোন করি।

কী ব্যাপার? সে ফোন ধরছে না কেন? আটটা বেজে গেছে! অফিস টাইম পার হয়ে যাচ্ছে। উঠে গিয়ে তার দরজায় নক করি; কিন্তু কোনো সাড়া পাই না। হোটেলের রিসেপশনিস্টের কাছে জানতে চাইলাম, সে বাইরে গেছে কি না। তারা জানাল সে বাইরে যায়নি। ভেতরেই আছে। এবার আমার ভয় হতে থাকে। তবে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি তো? হোটেল-কর্তৃপক্ষ একটি বিকল্প চাবি এনে দরজা খুললে আমরা দ্রুত তার রুমে ঢুকে। ঢুকে দেখি, সে ঘুমিয়ে আছে।

কাছে গিয়ে দেখি, সে জিহ্বায় কামড় দিয়ে ঘুমিয়ে আছে! তার চেহারার রঙ পাল্টে গেছে। তার হাত ধরে ডাকতে থাকি—'সালেহ... সালেহ...।' কিন্তু সালেহ কোনো সাড়া দেয় না। আড়মোড়া ভেঙে বলে না 'এত সকালেই বিরক্ত করছিস কেন? যা, আরেকটু ঘুমাই'।

তার এই মর্মান্তিক পরিণতি দেখে আমরা সকলেই ঘাবড়ে যাই। দ্রুত তাকে হসপিটালাইজড করি। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন এবং রিপোর্ট দেখে বলেন, হার্টএ্যাটাক হওয়ার কারণে গত রাতেই সালেহের মৃত্যু হয়েছে।

কোথায় গেল যৌবন! কোথায় গেল সুস্থতা! গত রাতে আমরা একসাথে সময় কাটালাম। কত মাস্তি করলাম। অথচ তখন সে দিব্যি সুস্থ ছিল।

একেই কি বলে আকস্মিক মৃত্যু? এই মৃত্যু কখন কাকে শিকারে পরিণত করে আমরা তা জানি না? সে কোনো প্রকার ভূমিকা ও পূর্বঘোষণা ছাড়াই আঘাত হানে। সালেহের এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমার মধ্যে ভাবান্তর ঘটে। আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, এত কিছুর পরও আমি কেন ভালো হচ্ছি না? আমি কোন মুখে আল্লাহর সাথে দেখা করব? কী নিয়ে তার দরবারে হাজির হব? আমার কী আমল আছে? আমি কী করেছি? কিছুই না! কিছুই না!

ভেতরে প্রচণ্ড অনুশোচনা কাজ করতে থাকে। আমি ভাবতে থাকি, কী করছি আমি! কীসের পেছনে ছুটছি! আমি স্পষ্টতই বুঝতে পারি, আমি আল্লাহর হক আদায়ে পিছিয়ে আছি। অনেক বেশি পিছিয়ে আছি।

এতটুকু বলে সে থামে। আমরা দুজনেই অঝোরে কাঁদতে থাকি। সে অনুশোচনায় আর আমি কৃতজ্ঞতায়। এরপর থেকে আমাদের দিনগুলো স্বপ্নের মতো কেটে যেতে থাকে।